ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র: নিরন্ন নিঃস্ব শিকড়চ্যুত মানুষের ক্যানভাস

মনিস রফিক

১৯৭৬ সালের ফ্রেব্রুয়ারির ছয় তারিখ রাত এগারটা পাঁচ মিনিটে ঋত্বিক ঘটক চলে গেলেন। ঋত্বিক চলে যাবেন সেটা সবাই জানতেন। তিনি নিজেও জানতেন। চব্বিশে ডিসেম্বর শেষ বারের মত জ্যান্ত অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ঋত্বিক যখন বন্ধু মৃণাল সেনের বাড়িতে গেলেন, তখন তিনি ধুঁকছিলেন। ধুঁকতে ধুঁকতে কথা বলছিলেন আর হাসছিলেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা বন্ধু মৃণাল সেনের বাড়িতে সেদিন ঋত্বিক অনেক খেলেন, বললেন, মদ আর খাবেন না। দিলখোলা আকাশ কাপানো হাসি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আর বেশিদিন বাঁচব না।' কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, 'এ যাত্রায় তো টাঁসলাম না। দেখা যাক!'

ছয় তারিখে ঋত্বিক যখন চলে যাচ্ছেন, মৃণাল সেন তার পাশেই দাঁড়িয়ে। ঋত্বিক সেদিন তাঁকে দেখতে পাননি। তিনি তখন মারা যাচ্ছেন। কোমায় আচ্ছন্ন ঋত্বিক, দামাল ঋত্বিক, বেপরোয়া ঋত্বিক, অসহিষ্ণু ঋত্বিক, বিশৃঙ্খল ঋত্বিক। ঋত্বিক ঘটক মারা গেলেন।

কে জানে, হয়তো মারা গিয়েই তিনি বাঁচলেন। শেষ ক'টা বছর ঋত্বিক ঘটকের বেঁচে থাকাটাই ছিল একটা বিরাট অঘটন। ঋত্বিক ঘটকের জীবন মানেই তো ঘটন-অঘটনের এক বিশাল ক্যানভাস। সারাটা জীবন যতটুকু না তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি অতৃপ্তিতে কাটিয়েছেন তিনি। আর এ অতৃপ্তি, দুঃখ-কষ্ট তার জীবনে ঝড়ো হাওয়ার মত এসে তাঁকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। তাঁর জীবন-চিন্তার জন্য।

ব্যক্তি ঋত্বিক সমষ্টির দুঃখ-কষ্টকে ধারণ করেছিলেন। সেলুলয়েডে চোখ রেখে বারবার তুলে আনতে চেয়েছিলেন শিকড়চ্যুত নিরন্ন মানুষের জীবনকে। জানাতে চেয়েছিলেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে। বলতে চেয়েছিলেন, বঞ্চিত মানুষগুলোর জন্য ভাবতে। কিছু করতে।

হয়তো বা এই বলার চেষ্টাটাই তাঁর জীবনটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। প্রযোজকরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হয়তো পোট-বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শাসকরা তাকে বিভিন্ন উপায়ে থামাতে চেয়েছিল। কিন্তু ঋত্বিক তো বাংলা চলচ্চিত্রের দামাল শিশু। নিজেকে ছিন্ন-ভিন্ন করে হলেও তিনি আমৃত্যু সেলুলয়েডের ফিতেয় বলতে চেয়েছিলেন- যাযা তিনি থারণ করতেন, যা তিনি বিশ্বাস করতেন, তা তিনি করবেনই। তাইতো তাঁর মৃত্যুর প্রায় ষোল বছর পূর্বে সুপরিচিত ব্রিটিশ লেখিকা এবং সত্যজিৎ রায়ের জীবনীকার মারি সিটন ঋত্বিক ঘটক সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'ঋত্বিক ঘটকের শিল্পকর্ম দারুণ দুঃসাহসিক, মননশীল এবং বেশ কিছুটা যুক্তিবাদী কিংবা তার্কিক'। মারি সিটন আরো বলেন, 'সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে লক্ষণীয় হল তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের সংহতি এবং শুভবুদ্ধি। ঋত্বিক ঘটক ঠিক এর বিপরীত। তিনি হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের দামাল শিশু (infant terrible)। কিংবা, যদি তাঁর শক্তি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে, তিনি হয়তো কালে আর একজন ইঙ্গমার বার্গম্যান হয়ে উঠতে পারেন।'

ঋত্বিক ঘটক ইঙ্গমার বার্গম্যান হয়ে উঠেছেন কি হননি, সেটা বিজ্ঞ চলচ্চিত্র দর্শকরা বিচার করবেন। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক বাংলা চলচ্চিত্রের ঋত্বিক হয়ে উঠেছেন যিনি পৌরোহিত্য করেছেন সেইসব চলচ্চিত্রের যথা উঠে আসে বাস্তচ্যুত নিরন্ন মানুষের বেদনার কথা।

বাংলার সমান প্রাণ আর মানবিক দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ নিয়েই জন্মেছিলেন ঋত্বিক কুমার ঘটক। হয়তো সেজন্যই সমষ্টির ব্যাথা ধারণ করে আমৃত্যু জেগেছিলেন তিনি সমস্ত অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে। ১৯২৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর ঋত্বিক ঘটক যখন তাঁর প্রাণপ্রিয় যমজ বোন প্রতীতি দেবীকে নিয়ে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছিলেন তখন তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক ঢাকা ডিস্ট্রিক ম্যাডিস্ট্রেট। সরকারী চাকুরীর পাশাপাশি তিনি তখন নব্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহে দুই দিন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার ক্লাস নিতেন। ১৯২৫ সালে ঢাকার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট একজন বাঙালি, সেটা কিন্তু অবশ্যই ভাববার মত একটি বিষয়। কারণ ইংরেজ জমানায় বাঙালিদের দৌড় সাধারণত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতো। সাদা চামড়ার ইংরেজরা কালা বাঙালিকে ঐ পদের ওপরে দেখতে চাইতো না। কিন্তু অসম্ভব মেধাবী এবং যোগ্য প্রশাসক সুরেশচন্দ্র ঘটককে ইংরেজরাও সমীহ করতো তাঁর প্রজ্ঞা ও কর্মনিষ্ঠার জন্যে। এই ব্যক্তিই ঋত্বিক ঘটকের জন্মের পরের বছরই চট্টগ্রাম এবং আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জেলার প্রশাসক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

ঋত্বিকের বাল্যকাল ইংরেজ আমলের ইংরেজী কায়দায় কিছুটা কেটেছিল ফলে তার বেড়ে ওঠা এবং চিন্তা চেতনাও স্বাভাবিক ভাবেই হওয়া উচিত ছিল সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের চিন্তার স্রোতের মত। অথচ বাল্যকাল থেকেই তিনি চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন নিরন্ন অসহায় মানুষের দিকে। পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত আমলাতান্ত্রিক পরিবেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সেই ছোট বেলা থেকেই দূরন্ত ঋত্বিক ছুটে বেড়িছেছেন পদ্মার চরে। সঙ্গে রাখতেন প্রিয়সঙ্গী বাঁশি। মাঝে মাঝেই করুণ সুরে একমনে এমনভাবে বাজিয়ে চলতেন যে মনে হতো তাঁর বাঁশিতে ফুটে উঠছে সমষ্টি মানুষের না বলা বেদনার করুণ সুর। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গী হয়েছিল সরোদ। কখনও ওস্তাদ বাহাদুর খানের সাথে আবার কখনো একমনে বাজিয়ে চলতেন হৃদয় চুরমার করে দেওয়া সরোদ-সঙ্গীত।

দূরন্ত ঋত্বিকের সমষ্টির ব্যাথা ধারণ করার প্রতম প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ দেখা যায় তিনি যখন অষ্টম শ্রেমীর ছাত্র। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে পড়া অবস্থায় তাকে পাঠানো হয়েছিল কানপুরের টেকনিক্যাল স্কুল, বড় ভাইয়ের কাছে। আশা করা হয়েছিল ওখানে গেলে তাঁর পড়াশুনা ভালো হবে। কিন্তু কানপুরে মিলে শ্রমিকদের দুঃখ কষ্ট কাছ থেকে দেখে তিনি নিজেকে আর সুবোধ বালক হিসেবে মেনে নিয়ে পুঁথির বিদ্যায় মনোনিবেশ করেননি। বরং তাঁর বিদ্রোহী মন সেই বয়সেই শ্রমিকদের ওভারটাইম আদায়ের সংগ্রামে তাঁকে পথে নামিয়েছিল। বালক ঋত্বিক পথে নেমেছিলেন, গলা ফাটিয়ে বঞ্চিত শ্রমিকদের দাবী আদায়ের শ্লোগান দিয়েছিলেন। জড়িয়ে গিয়েছিলেন বাম চিন্তা চেতনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে।

কানপুরে ঋত্বিককে বেশিদিন থাকতে দেওয়া হয়নি। ফিরিয়ে আনা হয়েছিল আবার রাজশাহীতে। সেখান থেকেই তিনি পার হলেন স্কুল ও কলেজের চৌহদ্দি। তবে একেবারে সুবোধ উঁচু তলার কোন ভদ্র বালকের মত তিনি তার দিনগুলো কাটাননি। বরং দূরন্ত, প্রত্যয়ী আর বঞ্চিত মানুষের দুঃখ কষ্ট মোচনে, এক ভয়ংকর তরুণ যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে তৈরী করতে থাকলেন প্রতি পদে পদে। তাঁর যৌবনের সেই শুরুর দিনগুলোতেই তিনি রাজশাহীতে চালিয়ে যেতে থাকলেন নাট্য আন্দোলন। আর নিজ সম্পাদনায় বের করতে থাকলেন অভিধারা পত্রিকা। লিটল ম্যাগ মেজাজের অভিধারা পাঠকদের মধ্যে বিসময়ের চিন্তা জাগিয়ে তুলেছিল। ঊনিশ-বিশ বছরের একজন যুবক কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন সমাজের সামষ্টিক মানুষের ক্ষতগুলোর দিকে। কী পরম ভালোবাসায় তিনি মন থেকে চাইছিলেন চিরদিনের জন্য নির্মূল করতে ঐসব ক্ষতগুলোকে। ভাবতেই অবাক লাগে, ঐ বয়সের একজন যুবকের কলম থেকে বের হয়েছিল 'অয়নান্ত', 'এজাহার' এবং 'কমরেড' এর মত সব কালজয়ী ছোট গল্প। ভাবলেই, মাথার টুপি খুলে তাঁর সামনে মাথা নামিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাতে হয়।

১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেনরা বাংলা ভাগ করলেন। ঋত্বিকের মতে, সোনার বাংলাটা ভেঙ্গে গেল। পরিবারের সবার সাথে তাঁকে যেতে হলো কোলকাতায়। নতুন বাস্তুভূমির সন্ধানে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পত্তনি হওয়া জব চার্ণকের কোলকাতা তখন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। রাজশাহীর মত একটি ছোট নগরে বড় হওয়া ঋত্বিক সেদিন দেখেছিলেন পূর্ব বাংলা থেকে লাখে লাখে হিন্দু ধর্মের নামধারী শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-নর-নারী ছুটছে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। ধর্মের দাগে ভাগ হয়ে যাওয়া ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম বাংলাকে পূর্ব বাংলার হিন্দুরা মনে করেছিল, তাদের স্বস্তির জায়গা। কিনতু ধীরে দীরে অধিকাংশ দেশ ছাড়া মানুষরা দেখলো ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাওয়া স্বাধীন দেশের স্বাধীনতার মূল্য কত কঠিন। ঋত্বিক দেখলেন, শিকড় থেকে উপড়ে আসা পূর্ব বাংলার অসংখ্য মানুষ তাদের স্বপ্ন হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের কেউ হলেন গৃহহীন ভিখারী, কেউবা অসহায় নুয়ে পড়া নির্বাক মানুষ আর কেউবা বেশ্যা।

এই মানুষগুলোর সীমাহীন কষ্টগুলো কাছ থেকে দেখা। ঋত্বিক নাটক ছেড়ে আশ্রয় নিলেন সেলুলয়েডের ফিতেয়। নিজের সাতাশ বছর বয়সে তিনি প্রথম বানালেন 'নাগরিক' ছবিটি।

'নাগরিক' ছবির নায়ক রামু কোলকাতার অগণিত নাগরিকের মধ্যে একজন। কিন্তু অফিসপাড়ার অরণ্যের মধ্যে সে একজন বিশেষ নাগরিক। ছবির শুরুতে তার বৈশিষ্ট্য কিন্তু আর দশজন মধ্যবিত্ত যুবকের মত ভালো করে বাঁচার আকাঙ্খা। বাবার অবসরের পর অর্থের অভাবে তারা শ্যামপুকুরের বড় বাড়ি ছেড়ে কোলাকাতায় ঘিঞ্জি এলাকায় বাসা ভাড়া করে। নতুন ভাড়া বাড়িতে মায়ের মত রামুও হাঁপিয়ে ওঠে। সে স্বপ্ন দেখে খোলা পরিবেশে সুস্থ করে বাঁচবার। কিন্তু ব্যর্থ হয় বারে বারে। যে চাকুরীর জন্য সে হন্যে হয়ে ছুটতে থাকে, তার সন্ধানে বার বার হোঁচট খেতে থাকে, সে চাকুরী পায় না। বরং বর্তমানের ঘিঞ্জি আবাসস্থল ছেড়ে কম ভাড়ার আরো ঘিঞ্জি কোন পরিবেশের দিকে রামু, তার মা-বাবা ও বোন যাত্রা শুরু করে।

নাগরিক ছবিতে রামুকে তার একক জীবনের স্বপ্নকে অতিক্রম করে আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত সমাজের বৃহত্তর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কোনো অতি নাটকীয় মুহূর্ত ব্যবহার না করে একেবারে অল্প কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে এ কাহিনী গড়ে উঠেছে। রামুর জীবন প্রধানত দুটি ভাবের চাপে দোদুল্যমান। একদিকে বাবা মা ও অবিবাহিত বোন। অন্যদিকে প্রেমিকা উমা, তার ছোট বোন শেফালি ও নেপথ্যে তাদের বিধবা মা। এ ছাড়া তাদের পেয়িং গেস্ট সাগর সেন, ঊদরসর্বস্ব যতীনবাবু এবং রামুর বন্ধু সুশান্ত যে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন করবার ফাঁকে ফাঁকে রামুকে বাঁচার সংগ্রামে শামিল হতে আহ্বান জানাত। নাগরিক চলচ্চিত্রে একটি চরিত্রকে নক্শার মতো করে সাজিয়ে রামুর বাঁচার লড়াইকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঋত্বিক ঘটক যখন নাগরিক বানালেন, তখন তিনি সবে মাত্র সাতাশ বছরের এক যুবক। কিন্তু কী অদ্ভুত মুন্সীয়ানা দেখালেন তিনি কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণে। শেষমেষ রামু'র চাকুরী হয় না, কিন্তু রামু হতাশায় ডুবে যায় না বরং আরো বেশি সাহসী ও প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে নতুন দিনগুলোয় মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাবে বলে।

রামুর জীবনের রোমান্টিকতাকে দুভাবে দেখানো সম্ভব ছিল। রামুকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মত দাঁড় করানোর চেষ্টা করা অথবা নিজের সুখ স্বপ্নকে কম প্রাধান্য দিয়ে সমাজের বৃহত্তর অংশের সম্মুখীন করা। ঋত্বিক দ্বিতীয় পথেই রামুকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রোমান্টিকতাকে তিনি প্রথম থেকেই ব্যবহার করেছেন বৃহত্তর

সমাজ চেতনার হাতিয়ার হিসেবে। এ জন্যই বোধ হয়, বাস্তবের মধ্যে তিনি এক বিশেষ গতি এবং প্রাণের সঞ্চার করে আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্রে বাস্তববাদকে নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেন। হয়তো, ঋত্বিকের এই চিন্তাধারাকে সম্মান জানাতে গিয়েই সত্যজিৎ রায় নিজেই বলেছিলেন, 'ঠিক সময় নাগরিক মুক্তি পেলে ঋত্বিক ঘটকই হতেন পথিকৃৎ'। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের দুর্ভাগ্য 'নাগরিক' ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল এর তৈরির পংচিশ বছর পর, ১৯৭৭ এর ৩০ সেপ্টেম্বর। ততদিনে ছবির নির্মাতা অনেক দুঃখ-কষ্ট আর অভিমানে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

প্রথম ছবি 'নাগরিক' সময়মত মুক্তি না পাওয়ায় ঋত্বিক বেশ কয়েক বছর মনোবেদনায় ভুগেছিলেন। তারপর ১৯৫৮ সালে তিনি তৈরি করলেন বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের এক কালজয়ী ছবি 'অযান্ত্রিক'। তাঁর এ ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মারি সিটন বার বার উল্লেখ করেছেন, 'ঋত্বিক ঘটকের সবচেয়ে চিন্তা সমৃদ্ধ ও সবচেয়ে সংহত চিত্রসৃষ্টি হল 'অযান্ত্রিক'।

১৯২০ সালের মডেলের পুরোনো একটা ভাঙা শেভ্রোলের লক্কর ঝক্কর ট্যাক্সি যে একটি ছবির অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে, তা দর্শকরা বিস্ময়ের সাথে দেখেছিল। 'অযান্ত্রিক' ছবির নায়ক বিমল আর নায়িকা বা উপনায়ক হচ্ছে জগদ্দল নামের এই ভাঙা গাড়িটি। নিঃসঙ্গ বিমলের একমাত্র সঙ্গী ও বন্ধু তার জগদ্দল। আমরা তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না। শুধু দেখি গাড়ীর গ্যারেজের পাশে ছোট একটি ঘরে সে থাকে। বিমলের মুখ দিয়েই জানতে পারি পনের বছর আগে যখন তার মা মারা যান, তারপর থেকেই জগদ্দল হয়েছে তার একমাত্র আপনজন, আত্মার পরম আত্মীয়। যার ফলে জগদ্দলকে সে সবসময় আগলিয়ে রাখে পরম মমতায়। তার এ ব্যবহার অনেক সময় মনে হয়, কোন প্রেমিক তার সব কিছু উজাড় করে দিচ্ছে তার প্রেমিকাকে।

বিমল ঘরহীন মানুষ কিন্তু তার সব না পাওয়াকে ভুলিয়ে দেয় তার উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম জগদ্দল। তবে জগদ্দলকে সে কখনো নিছক উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখেনি। বরং ঝক্কর মার্কা জগদ্দলকে যখন সবাই বাধা দিত বলে, তখনো সে তার সঞ্চিত সব অর্থ দিয়ে জগদ্দলকে সাজাতে চায়, ঠিক করতে চায়। কিন্তু বয়সী জগদ্দল শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। অসহায় মলিন বিমল শুধু দেখতে থাকে কিভাবে স্ক্র্যাপারের লোকজন এসে ভাঙা জগদ্দলকে মণ ধরে কিনে ঠেলা গাড়ীতে করে নিয়ে যায়। বিমলের কপাল থেকে ঘাম বের হয়, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। অসহায় বিমল শুধু চেয়ে থাকে জগদ্দল নামে এক ভাঙা যন্ত্রের দিকে যে তার কাছে যন্ত্র থেকে অযন্ত্রে পরিণত হয়েছিল, যে ছিল তার মনের মানবী।

ঋত্বিক ঘটক নিজেই বলেছেন, 'অযান্ত্রিক' ছটির বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছি দীর্ঘ বারো বছর ধরে।' নিশ্চয় তাঁর সেই দীর্ঘ বিনিদ্র ভাবনার ফলই হচ্ছে 'জগদ্দল' এর অযান্ত্রিক হয়ে ওঠা।

'অযান্ত্রিক' ছবিটি যখন বিশেষ প্রদর্শনীতে ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় তখন এটি অকুণ্ঠভাবে প্রশংসিত হয় বিখ্যাত চলচ্চিত্র-সমালোচক ও ঐতিহাসিক জর্জ সাঁদুল-এর দ্বারা। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখলেন- অযান্ত্রিক কথাটির অর্থ কী? আমার তা জানা নেই এবং আমার মনে হয় ভেনিসে কেউই তা জানেন না, যেখানে ভারতবর্ষের চৌদ্দটি প্রধান ভাষা সম্পর্কে প্রত্যেকের জ্ঞানই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অন্তত এটুকু আমার জানার সুযোগ হয়েছিল যে ঋত্বিক ঘটক হচ্ছেন একজন তরুণ পরিচালক।

ছবিটির পুরো কাহিনী আমি বলতে পারব না। আমি বাংলা জানি না এবং ছবিতে কোন সাব-টাইটেলও দেওয়া ছিল না। কিন্তু ছবিটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি সম্মোহিতের মতো দেখেছি। আপনারা কি কেউ অষ্টাদশ শতকের লেখক টরমেসের লেখা লাজারিলো-র মতো কোনো স্পেনীয় চিত্রধর্মী উপন্যাস পড়েছেন? ভারতবর্ষ থেকে আসা 'অযান্ত্রিক' নামের এই ছবিটিকে বলা চলে অসাধারণ চিত্রধর্মী উপন্যাস। আঠারো শতকের বিখ্যাত ফরাসি উপন্যাস জিল ব্লাঁ সাঁতিলান -এর নায়কের মতো এই ছবির নায়কও একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। ১৯২০ সালের মডেলের একটি পুরোনো শেভ্রোলের গাড়ির প্রতি হয়েছে তার প্রচণ্ড অনুরাগ, আর তাকে সে ভালোবেসে নাম দিয়েছে জগদ্দল।

জনা কুড়ি খদ্দেরের হয়ে দূরপাল্লার ভাড়া খাটার পর একদিন সেই ড্রাইভারের কাছে এক সুন্দরী মহিলা এলেন যাত্রী হিসেবে। ড্রাইভারটি মহিলাটির এতই প্রেমে পড়ে গেল যে সে তার জগদ্দল এর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল, কারণ গাড়িটি কিছুতেই আর চলতে চাইছিল না। বুড়ো গাড়িটার মেজাজও গেল বিগড়ে, আর তার ফলে বাচ্চাকাচ্চার দল এই পবিত্র যাত্রার বিরতির স্থানে ড্রাইভার আর গাড়িটাকে কাঁদা ছুড়ে ছুড়ে মারতে লাগল। অবশেষে গাড়িটি এক অরণ্যের ভেতরে আধা-জাংলা এমন এক জায়গায় ভেঙে পড়ল যেখানে বাস করে বিচিত্র সব উপজাতীয় লোকেরা। ড্রাইভারটি তার গাড়ির কাছে ক্ষমা চাইল, তাকে নতুন করে রং দিল এবং নতুন রড আর পিস্টন কিনে দিল। কিন্তু বেশ কয়েকবার নানারকম ঘর্ঘর আওয়াজ করে গাড়িটি অবশেষে মৃত্যুকেই বরণ করে নিল। তখন সেটিকে পুরোনো লোহালক্কণের কারবারির কাছে ওজন -দরে বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না।

এই ড্রাইভারটি যেমন জগদ্দল এর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল-তা সে যতই বেপরোয়া অদ্ভুত আর খামখেয়ালি হোক-না-কেন-আমিও ঠিক তখনই এই ছবিটির প্রেমে মজে গেছি।'

১৯৫৯ সালে ঋত্বিক ঘটক নির্মাণ করলেন 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। ছবিটিকে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম সার্থক শিশু চলচ্চিত্র বলা যেতে পারে। বাবার কড়া শাসন ও চোখ রাঙানির থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে থাকা বালক কাঞ্চন একদিন মমতাময়ী মাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল অজানার উদ্দেশ্যে। অজানা বলতে কাঞ্চনের অদেখা বিস্ময়কর নগরী কোলকাতা।

বালক কাঞ্চন ঘুরতে থাকে কোলকাতার এপাশ থেকে ওপাশ। পরিচয় হয় তার সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে। সেইসব মানুষগুলোর কেউবা বাউল, কেউ আবার ভবঘুরে আর কেউ নিঃসঙ্গ গৃহিণী। কাঞ্চনের চোখে যেমন ধরা পড়ে কোলকাতার বিভিন্ন আনন্দের উপসঙ্গ তেমনি ধরা পড়ে নগ্ন দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক পেষণ। সবশেষে, কাঞ্চন উপলব্ধি করে, বাড়ির চেয়ে ভালো কিছু নেই।' এমন এক প্রশান্তিময় বাড়িই ঋত্বিক ঘটক হারিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের কারণে। রাজশাহী শহরের পদ্মার কোলে ঘেঁষে তাঁদের যে বাড়িতে তাঁর কেটেছিল শৈশব, কৈশোর আর যোবনের প্রথম কাল, সেই বাড়ির ছায়া তিনি কখনো ভুলতে পারেননি জীবনে। তাইতো মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও পদ্মাকে স্মরণ করতেন তিনি গভীরভাবে।

ঋত্বিক ঘটক 'মেঘে ঢাকা তারা' বানালেন ১৯৬০ সালে। সম্ভবত ঋত্বিকের এই ছবিটিই সাধারণ দর্শকদের হৃদয় সবচেয়ে বেশি ছুঁয়েছিল এবং ছবিটি নির্মাণের পঞ্চাশ বছর পরেও ঋত্বিক ঘটকের নাম উচ্চারিত হলেই 'মেঘে ঢাকা তারা'র কথা উঠে আসে। বাংলা বিভাগের দূর বয়ে বেড়ানো একটি পরিবারের কথা বাংলা চলচ্চিত্রের কেউ এমনভাবে বলতে পারেননি। এক সময়ে স্কুল শিক্ষক বাবার চার সন্তানের বড় মেয়েটি কীভাবে সমস্ত পরিবারের দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে চলে ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এ ছবিতে এই বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সাথে উঠে এসেছে শিকড়চ্যুত মানুষের বেদনার কথা। নীতা নামে যে মেয়েটি সকলকে স্বস্তি দেবার জন্য প্রাণঅন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় সেতো দেশ বিভাগের ক্ষতেরই এক দৃঢ় উদাহরণ। বড় ভাই শংকরের গায়কী দৌলতে যখন পরিবারের সবার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে শুরু হয়েছে, তখনই নীতা কালো কাকের মত শ্রীহীন হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের প্রেমিক বিয়ে করে নীতারই সুন্দরী ছোট বোনকে। হয়তো এর কিছুর পর তার আর বেঁচে থাকার কিছুই ছিল না। মরণব্যাধি যক্ষ্মাই আক্রান্ত হয়ে ভাই শংকরের ভালোবাসায় নীতা যখন শিলং পাহাড়ের যক্ষা নিরাময় কেন্দ্রে, তখনই সে আবিষ্কার করে নিজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বেঁচে থাকার প্রবল আকুতি। চিৎকার করে সেই কথা সে জানাতে চেয়েছিল ভাইকে। শিলং পাহাড়ের উপত্যকা থেকে উপত্যকায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে বাজতে থাকে নীতার বাঁচতে চাওয়ার আস্পৃহ আকুতি। কিন্তু জীবন সমাজের মেঘ ফুঁড়ে সে আর বের হতে পারে না। শুধু দর্শক হৃদয়ে গেঁধে দেয় করুণতর এক ট্রাজেডিকে। 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখে সেই রকম তৃপ্তি পেলুম যাতে মন আবার জীবনের করুণরূপে অভিভূত হয়ে যায় এবং শিল্পের সংবেদন থেকে উৎসারিত একযোগে পরিগ্রহণ ও প্রতিবাদে তীব্র শুদ্ধি লাভ করে। পন্ডিতেরা একেই বোধহয় ট্র্যাজেডির স্বরূপ বলেন। এই শুদ্ধিই বোধহয় সবচেয়ে উচ্চস্তরের শিল্প রচনার মাহাত্ম্য, যখন শিল্পরূপায়নের মধ্য দিয়ে একাত্ম হয়ে যায় শিল্পীর এবং দর্শক শ্রোতার জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনের পুরুষার্থ।'

পরের বছরই ঋত্বিক ঘটক তৈরি করলেন 'কোমল গান্ধার'। শিকড় থেকে উপড়িয়ে ফেলা মানুষের কষ্ট আরো বেশি মূর্ত হয়ে উঠে 'কোমল গান্ধার'-এ। নাটক পাগল একদল যুবক-যুবতী নিয়ে ছবির কাহিনী আবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু যে সূক্ষ্মভাবে ঋত্বিক তুলে আনলেন দেশ বিভাগের বেদনা তা আমাদের সবাইকে অভিভূত করে। ছবির শুরুতেই যে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় তাতে দর্শকরা দেখতে পায় নিজভূমি থেকে বিচ্যুত এক পিতার হাহাকার, 'ক্যান যামু, বুঝা আমারে। এন কোমল দ্যাশটা ছাড়ে, আমার নদী পদ্মা ছ্যাড়ে, আমি যামু ক্যান?' অথবা 'আমি পদ্মার পাড়ে জন্মাইলাম ক্যান?' 'কোমল গান্ধার' ছবিতে দেশত্যাগের বেদনা উঠে আসার সাথে সাথে বারে বারে পদ্মার কথা উঠে আসে। বিশেষ করে পদ্মার যে পাড়টা পশ্চিম বাংলার সেই পাড়ের ছবির প্রধান দুই চরিত্র অনুসূয়া আর ভীগু তাদের পূর্ব জীবনের কথা, নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা আমাদের জানায় তখন আমাদের সামনে ভেসে আসে সমস্ত শিকড়ছেঁড়া মানুষের বেদনার গান। 'ঐ পাড়ে আমার দেশের বাড়ি, ঐ যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে, কোনদিন আমি আর ওখানে পৌঁছাতে পারবো না, এটা বিশেষ। 'বিষন্ন ভীগু আমাদের আবার জানিয়ে দেয়, 'বাবা মারা গেলেন ভিখিরির মতন। মা এক রকম না খেতে পেয়েই শেষ হয়ে গেলেন।'

'মেঘে ঢাকা তারা'র রসটা আরো করুণ করার জন্যই হয়তো 'কোমল গান্ধার' -এর প্রয়োজন ছিল। তবে এটা আরো করুণতর করার জন্য। হয়তে আরেকটি ছবির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেজন্যেই পরের বছরই ঋত্বিক ঘটক বানালেন 'সুবর্ণরেখা'। শিকড়চ্যুত মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝানোর জন্য এই তিনটি চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে এক অপরের পরিপূরক। বলা যেতে পারে ভাঙা বাংলার গৃহহারা মানুষদের জন্য এ তিন ছবি হচ্ছে ঋত্বিক ঘটকের ত্রয়ী চলচ্চিত্র।

'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা শেষ পর্যন্ত বাঁচতে গিয়ে আর বাঁচতে পারেনি। মরণব্যাধি যক্ষা তাকে মৃত্যুর শীতল কোলে নিয়ে যায়। 'কোমল গান্ধার' এর অনসূয়া বারে বারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেশ বিভাগের বিষযুক্ত বাতাসে, আর 'সুবর্ণরেখা'র সীতা শেষ পর্যন্ত বেশ্যা হতে গিয়ে নিজের ভাইকে দেহ দেওয়ার আগেই ধারাল বটি গলায় চালিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে।

পরপর দিন বছরে এই তিনটি ছবি তৈরি করে ঋত্বিক ঘটক পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী মানুষেদের দিলেন। ঋত্বিক নিজেও তো ছিলেন একজন রিফিউজি। ফলে তিনি যা করেছেন, তা তিনি নিজের জীবন থেকেই করেছেন। তবে অদ্ভুত ব্যাপার 'সুবর্ণরেখা' করার পর থেকে প্রযোজকরা ঋত্বিক ঘটকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য। যে ঋত্বিক প্রতিনিয়ত মানুষদের অদৃশ্যভাবে ভাবতে বাধ্য করাচ্ছেন তাঁর ছবিগুলো নিয়ে, সেই ঋত্বিক আর প্রযোজক পেলেন না ছবি নির্মাণের। হয়তো এর মধ্যে রয়েছে গভীরতম কোন ষড়যন্ত্র। হয়তো শিকড়চ্যুত একজন এপার বাংলা থেকে গিয়ে কোলকাতায় ছবি বানিয়ে চালকের আসনে বসবেন, তা হয়তো কোলকাতাকেন্দ্রিক ছবির কর্তারা মেনে নিতে পারেনি। এমনকি এটাও হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারই চেয়েছিলেন ঋত্বিককে থামিয়ে দিয়ে কারণ ঋত্বিকের ছবি মানেই তে নিঃস্ব-নিরন্ন, বাস্তুচ্যুত মানুষদের কথা বলা, তাদের জাগিয়ে দেয়া, যাকে সবসময় ভয় করে শাসক সমাজ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কয়েকজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ঋত্বিক ঘটককে কোলকাতায় খুঁজে বের করলেন। তখন ঋত্বিক মানেই মাতাল ঋত্বিক। বড় বেশি মদ্যপ্রিয় ঋত্বিক। অথচ এই ঋত্বিকই পশ্চাশের দশকে স্টুডিওর ভেতরে মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ঋত্বিক ঘটককে বাংলাদেশে আনা হল ১৯৭৩ সালে। তিনি বানালেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস অবলম্বনে 'তিতাস একটি নদীর নাম'। তিতাস পাহাড়ে মানুষের জীবনকথা অপূর্ব সুন্দরভাবে চিত্রিত হল সেলুলয়েডে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর এই ৪১ বছরে হাতে কোনো কয়কটি সুন্দর ছবির নাম' চলে আসে সবার আগে।

ঋত্বিক ঘটক তাঁর শেষ কাহিনীচিত্র বানালেন ১৯৭৪ সালে। এবার ছবি বানানোর অর্থের জন্য এগিয়ে আসলেন স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গ সরকার। হয়তো ঋত্বিক এই ছবিটি করার জন্যেই বেঁচে ছিলেন। নিজের জীবনের কাহিনীই তিনি শুনালেন দর্শকদের তাঁর 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে। নিজেই অভিনয় করলেন নিজের চরিত্রে। নাম নিলেন নীলকণ্ঠ বাগচী। যিনি সারা জীবন নিরন্ন-নিঃস্ব শিকড় উপড়ানো মানুষদের বেদনার গরল পান করে নীলকণ্ঠী হয়ে গেছেন।

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ছবিটি নিছক আত্মজীবনী নয়। বরং আত্মসমীক্ষা ও আত্ম সমালোচনা। আর এই আত্মসমালোচনায় প্রচ্ছন্ন থাকে সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা আর গোটা বামপন্থী রাজনীতির সমালোচনা। যে দেশে প্রবীণ বা কোণ তরুণ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও সভা - সমিতি - পত্রিকা ও চায়ের টেবিল নিজের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রশ্নটিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে শুধু অন্যান্যদের খিস্তি দিয়ে কিস্তিমাত করতে ব্যস্ত, সেখানে ঋত্বিকের এই আত্মসমালোচনা যেন এক অবিশ্বাস্য ব্যতিক্রম, এবং তা শুধু চলচ্চিত্রেই নয়, বামপন্থী সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই। বলা যেতে পারে, 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' হচ্ছে ক্ষয়ে যাওয়া, পচে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন মাতাল হয়ে নিজের ও স্বশ্রেণীর সমালোচনা করেছেন। সবকিছুর পরেও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজ স্থান থেকে চ্যুত বঙ্গবালা চরিত্রের প্রতি নীলকণ্ঠ বাগচীর পরম স্নেহ আমাদেরকে শিকড়ছেঁড়া মানুষের প্রতি তাঁর প্রেমের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের আশপাশের বিষয়গুলো ঋত্বিক যেমনভাবে দেশজ সত্তায় একেবারে নিজের মত করে তুলে এনেছেন তা চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের বিস্মিত করে। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ঋত্বিক পরিপূর্ণভাবেই একজন ভারতীয় চিত্রপরিচালক, নিজের দেশকে দেখার জন্য তাঁকে হলিউড থেকে চশমা ধার করতে হয়নি।'

পঞ্চাশ দশকের একেবারে শুরুতেই, ঋত্বিক ঘটক তখনো ছবি বানানোয় হাত দেননি তখন সকাল হলেই ঘর থেকে বের হয়ে চলে যেতেন কোলকাতার হাজরা রোডের ছোট্ট এক চায়ের দোকানে। আট বাই বার ফিটের ন্যাড়া টেবিল আর ভাঙা চেয়ারে ঠাসা দোকানটার নাম চিল 'প্যারাডাইস ক্যাফে'। দলের মধ্যে সবচেয়ে রোগাটে, লম্বাটে আর ডাকসাইটে শরিক ছিলেন ঋত্বিক। আড্ডার টেবিল মাতিয়ে রাখা অন্যরা ছিলেন সলিল চৌধুরী, তাপস সেন, হৃষীকেশ মুখার্জী, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত এবং মৃণাল সেন। তাঁদের সেই আলোচনায় ওঠে আসতো মূলত সিনেমা আর সশস্ত্র বিপ্লব। সিনেমাকে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে তারা চলতে শিখেছিল সেদিন থেকেই। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অচঞ্চল বিশ্বাস রেখে সেদিন থেকেই তারা অন্ত:সারশূণ্য দেশজ সিনেমাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতে শিখেছিলেন।, নতুন একটা ফ্রন্ট গড়ার জন্য মুখিয়ে উঠেছিলেন 'প্যারাডাইস ক্যাফে'র ভাঙা চোরা-টেবিল ঠাসা ও ছোট্ট ঘরে, যে ফ্রন্টে বিপ্লব আর সিনেমা হাত ধরাধরি করে চলবে আর সিনেমা বলবে নিঃস্ব-নিরন্ন মানুষের কথা। সেই প্রাণচঞ্চল আসরগুলোয় যার গলা সবচেয়ে উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল তিনি হলেন বাংলা চলচ্চিত্রে নিরন্ন-নিঃশ্ব-শিকড়চ্যুত মানুষের কণ্ঠস্বর ঋত্বিক ঘটক।